বেগম রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্কতা

নাছিমা বেগম

বেগম রোকেয়ার সামগ্রিক জীবন পর্যালোচনায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানুষ। তিনি ভারতবর্ষের পিছিয়ে থাকা নারী-পুরুষের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর চিন্তায় কেবল নারীর জাগরণ ছিল না, ছিল নারী-পুরুষের সমান জাগরণ। বেগম রোকেয়ার জীবন সাধনায় আমরা একদিকে যেমন পাই তাঁর নিঃস্বার্থ কর্মোদ্যোগ, অপরদিকে পাই নিজ লেখনির মাধ্যমে কুসংস্কার ও সামাজিক অবক্ষয়রোধের নিরন্তর প্রয়াস।

আমরা জানি একজন আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চিন্তায় ও চেতনায় আধুনিক হওয়া। একজন মানুষ যখন চিন্তা ও চেতনায় আধুনিক হয়ে ওঠেন, তখন তার দৃষ্টি- ভঙ্গিতে থাকে যুক্তিবাদিতা। আর বিজ্ঞানমনস্কতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যবহারিক জীবনে যুক্তিপ্রবণ হওয়া। ব্যবহারিক জীবনে কোন মানুষ যুক্তিবাদী হলেই অবধারিতভাবেই তিনি বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির কাছে কুসংস্কারের অন্ধকার যেমন দূরীভূত হয়, তেমনি ভ্রান্ত ধারণার খোলসও খসে যায়। একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ কখনো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আবেগতাড়িত হয় না; বরং যুক্তির মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী চিন্তার মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক সুব্রত বড়ুয়া 'বেগম রোকেয়ার বিজ্ঞান চিন্তা' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসাই হলো বিজ্ঞানচিন্তার মূল বিষয়। বেগম রোকেয়ার রচনায় এই দুটি বিষয় বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। রোকেয়ার বিজ্ঞানচিন্তার মধ্যে যে বিষয়টি প্রধান তা বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ ও উপস্থাপন নয়, বরং বৈজ্ঞানিক যুক্তিশৃঙ্খলার মাধ্যমে নির্মোহভাবে তিনি সত্যানুসন্ধান করেছেন। তাঁর রচনায় একদিকে যেমন তীব্র শ্লেষ ও সমালোচনা রয়েছে, তেমনি তার বক্তব্যের অন্তরালে রয়েছে কুসংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী, পরিচ্ছন্ন জীবনসন্ধানী সচেতন একটি মন। রোকেয়ার অবরোধবাসিনী কেবল পর্দার অন্তরালের অবরোধবাসিনী নয়, বাইরের অবরোধের চেয়ে ভেতরের তথা মানসিকতার অবরোধ যে অনেক বেশি কঠিন। সে বিষয়টি তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আলস্য, কুসংস্কার, কুশিক্ষা, অশিক্ষা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম সফল করতে তিনি অযৌক্তিকতার অবরোধ অতিক্রম করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। বেগম রোকেয়ার বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তব্য ও চিন্তা ভাবনা তার সমকালীন সমাজকে কেন্দ্র করে বিবৃত হয়েছে। তিনি তাঁর যুক্তি, শানিত ভাষা এবং প্রসঙ্গ বিষয়াদি উপস্থাপন করেছেন অন্তরের অবরোধকে কেন্দ্র করে। অন্তরের অবরোধ অতিক্রম করাই ছিল তাঁর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে সুব্রত বড়ুয়া উল্লেখ করেছেন, উনিশ শতকে সূচিত পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষার ধারা এদেশের সমাজ জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। বিজ্ঞান-শিক্ষার উপযোগী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আনার ব্যবস্থা নেয়া হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, রসায়ন ও যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতি ১৮২৩ সালের এপ্রিলে কলকাতায় এসে পৌঁছায়। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক বই রচনা ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরফলে সূচনা লগ্ন থেকেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রয়াস বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়। বিজ্ঞান চর্চার প্রতি সাধারণ মানুষের বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু(১৮৫৮-১৯৩৭), আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) প্রমুখ ও বিজ্ঞানীর রচনা শিক্ষাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেগম রোকেয়ার অনুসন্ধিৎসু মন আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার এই আয়োজন ও উপকরণ প্রত্যক্ষ করেন এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি নিজের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে তা আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন।

বেগম রোকেয়ার রচনা সমগ্র পাঠে তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক চেতনার বিভিন্ন উপকরণ বিভিন্ন গল্প ও প্রবন্ধে পরিলক্ষিত হয়। তিনি কখনো রূপক অর্থে আবার কখনো সরাসরি বিজ্ঞানের ব্যবহার ও শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এপ্রসঙ্গে বিশিষ্ট রোকেয়া গবেষক মুহম্মদ শামসুল আলমের মতে, "পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের প্রগাঢ় প্রভাব রোকেয়ার বিভিন্ন রচনায় লক্ষণীয়। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, তাঁর সমসাময়িক কোন লেখিকার মধ্যে তো নয়, পুরুষদের লেখাতেও এমন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার তেমন নিদর্শন তখন দেখা যায় নি। 'সুলতানা'র স্বপ্ন', 'সৌরজগৎ', 'পদ্মরাগ', 'সুগৃহিনী', 'শিশু পালন' প্রভৃতিতে প্রচুর বিজ্ঞান প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। তবে বিজ্ঞানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, 'Sultana's Dream' -এ" (৩) এছাড়া তাঁর রচিত ‘এন্ডিশিল্প’, ‘বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল’ গল্প রচনায়ও বিজ্ঞানের প্রচুর প্রভাব দেখা যায়।

বেগম রোকেয়া 'সুগৃহিনী' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, রন্ধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে গৃহিনীর ডাক্তারি ও রসায়ন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা চাই। কোন খাদ্যের কী গুন, কোন বস্তু কত সময়ে পরিপাক হয়, কোন ব্যক্তির কিরূপ আহার প্রয়োজন এসব বিষয়ে গৃহিনীর জ্ঞান না থাকলে যথযথভাবে শরীরের পুষ্টি লাভ হয়না। কালাইবিহীন তামার পাত্রে কেউ দধি দিয়ে কোরমা রান্না করলে তা খাওয়ার উপযোগী থাকে না; তা বিষাক্ত খাবারে পরিণত হয়। তেমনি রোগাক্রান্ত পশুপাখির মাংস খেলে স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। টাটকা শাক সবজি খাওয়ার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি গৃহিণীদের নিজ আঙ্গিনায় শিম, লাউ, শশা, কুমড়া রোপণের সবজি বাগান প্রস্তুতের জন্য Horticulture সম্পর্কে জানার কথা বলেছেন। কোন্ মাটিতে কোন্ সবজি ভাল হয়, তা জানা না থাকলে ভালো ফলন আশা করা যায় না। রান্না শেখার ক্ষেত্রে তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন ও উত্তাপ তত্ত্ব শেখার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অসাধারণ। তিনি উল্লেখ করেছেন, পরিবারের কেহ অসুস্থ হলে গৃহিণীকেই প্রথমে রোগীর প্রাথমিক সেবা দিতে হয়। এ বিষয়ে তার উপযুক্ত জ্ঞান থাকা চাই। অনেক সময় না জেনে ভুল ঔষধ সেবন, যেখানে সেখানে ঔষধ রেখে শিশুদের জন্য বিপদ ডেকে আনা, রোগী ঘুমিয়ে থাকলে তাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ঔষধ সেবন করা, একবারের স্থলে তিন চারবার ঔষধ সেবন করানোর ক্ষতিকর দিকগুলো তিনি অত্যন্ত সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বের কথা বলি। রোকেয়া অত্যন্ত সুনিপুণভাবে 'সুগৃহিনী' প্রবন্ধে গৃহিণীদের মানসিক উন্নতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

'শিশু পালন' প্রবন্ধেও রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্কতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। আঁতুড়ঘরে শিশু মৃত্যুর কারণ কী? তা তিনি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এজন্য তিনি মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক মায়ের গর্ভে শিশুর জন্ম এবং যথাযথ পরিচর্যার অভাবে শিশুর মৃত্যু ঘটে। শিশুর সামান্য অসুখ হলেও যত্ন করা, শিশুদের পরিপাক অর্থাৎ হজম ঠিক হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা। কাঁদলেই দুধ না খাইয়ে অন্য কোন অসুবিধা আছে কিনা তারও খেয়াল করা। ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শমতো চিকিৎসা ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেছেন। তাঁর মতে এ শিশু মহামারীর আর একটা বিশেষ কারণ আমাদের দেশের বাল্যবিবাহ। এই প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া ডাক্তার ভারতচন্দ্রের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, 'মায়ের কর্তব্য না শিখে কেউ যেন মা না হয়। সে নিজেই ১২-১৩ বছরের বালিকা, সে আর কর্তব্য শিখতে সময় পেল কখন?' উক্ত ডাক্তার মহাশয়ের মতে কুড়ি বছর বয়সের আগে মেয়ের বিবাহ দিতে নাই। মেয়েদের শরীর যাতে ভালো থাকে সেদিকেও নজর রাখার দরকার। রোকেয়া আরও উল্লেখ করেছেন, বালিকা স্কুলে মেয়েদের শরীর ভালো রাখার জন্য ব্যায়াম করার ব্যবস্থা থাকলেও ছাত্রীদের মা -বাবা ড্রিল করতে বারণ করেন। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বও তারা উপলব্ধি করেন না। বেগম রোকেয়া 'শিশু-পালন' নিবন্ধে শিশু লালন-পালনের বিভিন্ন উপায়ের বিস্তৃত বর্ণনাসহ শিশু সুরক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ মায়েদের রক্ষা করার বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং ভবিষ্যত জননীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তাদের খাওয়া দাওয়ার বিশেষ যত্ন নেওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। (৫)

'এন্ডি শিল্প' গল্পে বেগম রোকেয়া উল্লেখ করেন এন্ডিগুটি প্রধানতঃ আসাম অঞ্চল এবং রংপুরে আবাদ হতো। এন্ডি পোকার গুটি থেকে রেশম উৎপন্ন হয়। এন্ডি পোকার প্রধান খাদ্য এরন্ড পাতা। সম্ভবত এরন্ড পাতা খায় বলে এই রেশমের নাম এন্ডি। রংপুরের সকল এলাকাতেই প্রচুর এরন্ড গাছ জন্মানোর ফলে প্রকৃতিগতভাবেই এরন্ডের জঙ্গল হয়। ফলে এরন্ড গাছ খুবই কম মূল্যে পাওয়া যায় বিধায় এন্ডিগুটি চাষে তেমন মূলধনের প্রয়োজন হয় না। এটি চাষে তেমন পরিশ্রমও নেই।

এন্ডি কাপড়ের বৈশিষ্ট্য হলো নতুন অবস্থায় এটি দেখতে ভালো লাগে না বিধায় এটি ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তবে এ কাপড় যত ধোয়া হয় বা যত পুরাতন হয় ততই সুশ্রী এবং ব্যবহারে আরামদায়ক, মসৃণ ও দেখতে চিকচিকে হয়।

বেগম রোকেয়া রীতিমতো অংক কষিয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে এন্ডিশিল্প ধরে রাখলে রংপুরের মানুষ লাভবান হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো কৃষক রমণীদের পোকা-পোষণ করায় উৎসাহ দেবার কোন লোক রংপুরে নেই। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেছেন, রংপুরের এন্ডি শিল্প বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (৬)

এই গল্প পাঠে দেখা যায়, রোকেয়া কী সুনিপুণতার সাথে ১১টি ধাপে এন্ডি গুটি আবাদের প্রণালী থেকে শুরু করে এন্ডিসুতা প্রস্তুত প্রণালীর বিশ্লেষণ করেছেন। এতে মনে হয় এবিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ কীটতত্ত্ববিদ।

বেগম রোকেয়ার ‘সৌরজগৎ’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আধুনিকমনস্ক গওহর আলী। তাঁর নয় কন্যা। এই কন্যাদের কয়েকজনের নামও রাখা হয় সৌরজগতের গ্রহের নামানুসারে। যেমন - মুশতরী, জোহরা, সুরেয়া যা নামের ক্রমানুসারে বৃহস্পতি, শুক্র এবং কৃত্তিকা। প্রত্যেহ সন্ধ্যায় গওহর কন্যাদের পাঠদান করেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি বিজ্ঞানের নানাদিক আলোচনা করতেন। একদিন তিনি কন্যাদের বিজ্ঞান বই পাঠের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন বায়ু কী? বায়ুর শৈত্য, উষ্ণতা, লঘুত্ব, গুরুত্ব; বায়ুতে কয় প্রকার গ্যাস আছে; কিরূপে বায়ু ক্রমান্বয়ে বাষ্প, মেঘ, সলিল এবং শীতল তুষারে পরিণত হয়। এভাবে নিয়মিত তাদের বিজ্ঞান চর্চা হতো।

বেগম রোকেয়ার এই গল্পের আরেক চরিত্র গওহর আলীর শ্যালক জাফর। তিনি অত্যন্ত নেতিবাচক চরিত্রের একজন মানুষ; নারীকে অবদমন করে রাখতে পছন্দ করেন। তিনি নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধী। একদিন পারিবারিক কথোপকথনের সময় মেয়েদের লেখাপড়াকে কেন্দ্র করে জাফর, গওহর আলীকে বিদ্রুপ করে বলেন, "কন্যাগুলি অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হইবে! সাধে কি তোমাদের সৌরজগৎ বলি। তোমার দুহিতা কয়টি গ্রহ, আর তুমি সূর্য্য!" মুশতরী, জোহরা, সুরেয়া - এই তারকাদের নামে গওহরের তিন কন্যার নামের ব্যঙ্গ করে জাফর বলেন, "তবে কেবল মঙ্গল, বুধ, শনি এ নামগুলো বাধ দেওয়া হইয়াছে কেন?”

অপর এক সন্ধ্যায় গওহর আলী কন্যাদের নিয়ে সৌরজগৎ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এসময় তিনি কন্যাদের ভালো করেই বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, প্রত্যেক গ্রহই সূর্যকে নিয়মিত প্রদক্ষিণ করে। তিনি উল্লেখ করেন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা যেমন গ্রহদের কর্তব্য, তেমনি তাদের প্রত্যেককে আলো দান ও যথাবিধি আকর্ষণ করা এবং এর সাথে নিজের মেরুদন্ডের উপর ঘোরাও সূর্যের কর্তব্য। এই সৃষ্টি জগতের প্রত্যেকেই আপন কর্তব্য পালন করছে। কারো কর্তব্য সাধনে ত্রুটি হলে সমষ্টির বিশাল বিশৃঙ্খলা ঘটে। এ বিষয়ে তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেন, মনে কর প্রত্যেক লোকের গৃহই একটি সৌরজগৎ এবং গৃহস্থের আত্মীয়-

স্বজনেরাও পরিবারের এক একটি গ্রহ। পরিবারের সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থের অবস্থানুসারে তারই মনোনীত পথে চলা। এবং গৃহস্থেরও কর্তব্য পরিবারস্থ লোকদের স্নেহরশ্মি দ্বারা আকর্ষণ করা, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা। এমনকি অভাবের কারণে খাদ্যের সংকট হলে, প্রথমে শিশুদের, অতঃপর আশ্রিত পোষ্যবর্গকে আহার করিয়ে সর্বশেষে নিজেদের আহার করা উচিত। যদি এই পরিবারের একটি লোকও স্বীয় কর্তব্যপালনে অবহেলা করে, তবে বিশৃঙ্খলা ঘটে পরিবারটি নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করে। গওহর তাঁর এই কথার স্বপক্ষে সৌরজগতের কক্ষপথ পরিক্রমার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, যেমন- কোন গ্রহ যদি আপন কক্ষকে অতিক্রম করে দূরে সরে যায়, তবে সূর্যের আকর্ষণ বিমুক্ত হলে সে অন্য কোন গ্রহের সাথে টক্কর খেয়ে নিজে চূর্ণ হবে এবং অপর গ্রহকেও বিপদগ্রস্ত করবে। সুতরাং যার যে কক্ষ তাকে সে কক্ষে থেকে স্বীয় কর্তব্য পালন করে চলতে হবে।

গওহর কন্যাদের সৌরজগৎ সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, সূর্যের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করতে বুধের প্রায় তিন মাস, শুক্রের আট মাস, বৃহস্পতির ১২ বছর এবং শনির ৩০ বছর সময় লাগে। এটাই গ্রহগুলোর ব্যক্তিগত পার্থক্য বা স্বাধীনতা। শনি গ্রহকে কেউ রক্তচক্ষে আদেশ করতে পারে না যে, তোমাকেও বুধের মত ৩ মাসেই সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরতে হবে। এইরূপ মানবের সৌরপরিবারেরও পরস্পরের মধ্যে কতগুলো সাদৃশ্য এবং কতগুলো বৈসাদৃশ্য আছে। এই গল্প পাঠে বিস্মিত হতে হয় যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কী পরিমাণ চর্চা বেগম রোকেয়া করেছেন! কত দিক তিনি জেনেছেন এবং কত সহজে মানুষের চরিত্রের সাথে তা যৌক্তিকভাবে মিলিয়ে দেখাতে পেরেছেন! যেমন সৌরজগতের চতুর্দিক প্রদক্ষিণের বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে এর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের সঙ্গে 'গওহর এবং জাফরের' কথোপকথনের তুলনা করে মানব-পরিবারের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন।

"বায়ুজানে পঞ্চাশ মাইল" গল্পটি একটি সত্য ঘটনার উপরে রচিত। বেগম রোকেয়া ১৯০৫ সালে যখন 'সুলতানার স্বপ্ন' লিখেছিলেন সেটি ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তখন এরোপ্লেন বা জেপেলিনের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। এমনকি সে সময় ভারতবর্ষে মোটর কারও আসেনি। বৈদ্যুতিক আলোক এবং বৈদ্যুতিক পাখা কল্পনারও অতীত ছিল। অন্তত তিনি তখন সেসব কিছুই দেখেননি বলে গল্পে উল্লেখ করেছেন। 'সুলতানার স্বপ্ন' লেখার প্রায় ছয় বছর পরে ১৯১১ সালে তিনি প্রথম হাওয়াই জাহাজ শুন্যে উড়তে দেখেন। কিন্তু কখনো উড়োজাহাজে উঠতে পারবেন এরূপ আশা তিনি কখনও করেননি। তবে তার উড়োজাহাজে চড়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুলতানের স্বপ্ন রচনার ২৫ বছর পর ১৯৩০ সালের ৩১ শে নভেম্বর রোকেয়ার জীবনে আকাশ ভ্রমণের সুযোগ আসে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি প্রথম মুসলিম পাইলট মিসেস রাসাদের ছেলে মোরাদের সঙ্গে প্লেনে চড়েন। ৩০০০ (তিন হাজার) ফিট উঁচুতে উঠে রোকেয়া জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন দক্ষিনে সূর্য, বামে ১১ই রজবের দ্বাদশীর পূর্ণ চন্দ্র। নীচে তাকিয়ে দেখেন কলকাতার পাকা বাড়ি, দালান-কোঠা-ইমারত, সব যেনো ইটের স্তূপ। হাবড়ার পুল'কে একটি খেলনা, আর হুগলি নদী একটা জলের রেখার মতো দেখাচ্ছিল। পঞ্চাশ মাইল চক্কর দিয়ে তাঁরা নীচে নেমে আসেন। বিমান-বীর মোরাদের সৎ সাহসের তিনি প্রশংসা করেন। কারণ এর মাত্র দুই মাস পূর্বে "আর ১০১" নামক বৃহৎ এরোপ্লেন ধ্বংস হয়ে ৪৫ জন হতভাগ্য যাত্রীর প্রত্যেকেই দগ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতির কারণে আতঙ্কগ্রস্ত অনেকেই সে সময় বিমানে চড়তে চাইতেন না। রোকেয়ার নিজেরও সাহস কম ছিল না। এইরকম একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা জানার পরও তিনি বিমান ভ্রমণ করে তাঁর অপার সাহসিকতার প্রমান দেন। বেগম রোকেয়া বিমানে চড়ার যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন, গল্পটিতে সে অভিজ্ঞতা, বিমান থেকে বহির্দৃষ্য দেখার অপরূপ সৌন্দর্য এবং ধরণীকে সরাতুল্য গণ্য করে এর বর্ণনা যেভাবে তুলে ধরেছেন তা একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ছাড়া অসম্ভব।

বেগম রোকেয়ার সবচেয়ে বেশি আলোচিত গ্রন্থ ‘সুলতানার স্বপ্ন’। এই রচনায়, নারীমুক্তির উপায় হিসেবে তিনি নারীর শিক্ষা; সাহসিকতা; বিজ্ঞানসচেতনতা; নারীর মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধির ব্যবহার এবং সর্বোপরি দেশের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সর্বস্তরে বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে তাঁর কল্পনায় গল্পের আকারে সাজিয়েছেন। গল্পের মূল চরিত্র নারী স্থানের ভগিনী সারা এবং সুলতানার কথোপকথনের মাধ্যমে রোকেয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে তথ্য চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা ছিল তার যুগের চিন্তার চেয়ে অনেক অগ্রগামী।

এই গল্পে নারীস্থানের মহারানী একজন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শাসক। তিনি শৈশব থেকেই বিজ্ঞান চর্চা করতে ভালোবাসতেন। তিনি নারী শিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে নিয়ে তাঁর রাজ্যের সকল নারীকে সুশিক্ষিত করতে চান। এজন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আইন প্রণয়ন করে তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন। তাঁর রাজত্বে ২১ বছরের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। নারীস্থানে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন; যেখানে ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতো। তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে স্বপ্ন-কল্পনা বলে পুরুষের উপহাস বিদ্রুপ শুননলেও উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপালদ্বয় মুখে এর কোন জবাব না দিয়ে কার্য্য দ্বারা উত্তর দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

একসময় সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন সকল কাজের জন্য বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু দিনের পর দিন অনাবৃষ্টির কারণে তাঁরা হতাশায় ভুগছিলেন। এঅবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য একটি নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিমতী লেডি প্রিন্সিপাল অভিনব এক বেলুন আবিষ্কার করেন। এই বেলুনে কতকগুলো নল সংযোগ করে বেলুনটি শূন্যে মেঘের উপর স্থাপন করেন। তিনি এই বেলুনের মাধ্যমে বায়ুর আদ্রতা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেন। এরূপে জলধরকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা বৃষ্টির জল করায়ত্ত করতে পেরেছিলেন। এই বেলুনের সাহায্যে তাঁরা বারো মাসের জন্যই পর্যাপ্ত পানি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারতেন। তখন সকলেই প্রয়োজন মতো ঐ বেলুনের পানি সকল কাজে ব্যবহার করতো। জলধর বেলুনে নল লাগিয়ে তাঁরা প্রয়োজন মতো শস্যক্ষেত্রে জলসেচ করতো। এতে দশ এগারো বৎসর সেখানে অনাবৃষ্টির কারণে চাষাবাদের যে ক্ষতি

হয়েছিল তার নিরসন ঘটে। বেলুনের মাধ্যমে আকাশ থেকে পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকায় মেঘমালা আকাশকে আচ্ছন্ন করতে পারতো না। এরফলে সেখানে প্রাকৃতিক বৃষ্টি, ঝর-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত হতো না; জলপ্লাবনের উপদ্রবও তাদের ভোগ করতে হতো না। তাঁদের রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার, কোথাও কাদা-পানি নেই।

ভগিনী সারা, সুলতানাকে আরো জানান, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জলধর বেলুনের সফলতা দেখে অপর নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের মনেও অসাধারণ কিছু আবিষ্কারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। অল্পকালের মধ্যে তাঁরাও গবেষণা করে এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, যার দ্বারা সূর্যের তাপ সংগ্রহ করে রাখা যায়। শুধু তাই নয় এই যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁরা প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ সংগ্রহ করে রাখতে যেমন পারতো; তেমনি ইচ্ছে মতো যেখানে ইচ্ছে বিতরণ করতে পারতো। যেমন তাঁরা এই সৌরতাপ একটি নলের মাধ্যমে রান্নাঘরে সংযোগের ব্যবস্থা করে। এতে সূর্যোতাপে তাঁরা সহজেই রান্নাবান্নার কাজ করতে পারতো। এছাড়া গ্রীষ্মকালে তাঁরা ইচ্ছেমতো জলধরের শীতল ফোয়ারায় ধরণী সিক্ত করে বাড়িঘর ঠান্ডা রাখতে পারতো। আবার শীতকালে সূর্য্যোত্তাপে তাদের ঘরবাড়ি ঈষৎ উষ্ণ করে রাখতে পারতো। তাঁর ফলে অতি-ঠান্ডা, অতি-গরমে তাদের কষ্ট করতে হতো না। (১৩)

ভগিনী সারা সুলতানাকে আরো জানান তাদের দেশ একবার শত্রুপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। তখন এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা দেশের সম্ভ্রম রক্ষায় এগিয়ে আসে। তাঁরা সৌর তাপের সাহায্যে ভয়ানক উত্তাপ সম্বলিত সার্চলাইট তৈরি করে। প্রস্তুতকৃত এই লাইটের মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত উত্তাপ-রশ্মী শত্রুপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করে। সার্চলাইটের তীব্র উত্তাপ প্রেরণের সময় তাঁরা নিজেরা যাতে কোন দুর্ঘটনার না পরেন, সেজন্য তাঁদের সুরক্ষায় জলধর বেলুনও রেখেছিলেন। প্রচন্ড সৌর উত্তাপ এবং তীব্র আলোক সহ্য করতে না পেরে শত্রুপক্ষ দিক-বিদিকে জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করে। এভাবে বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিনা রক্তপাতে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। এরপর তাদের নারীস্থান আর কখনো কারো দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। (১৪)

নারীস্থানে 'চপলা' অর্থাৎ বিদ্যুতের সাহায্যে চাষাবাদ করা হতো। বিদ্যুতের সাহায্যে তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ করেন। ভারী বোঝা উত্তোলন ও ব্যবহার কার্য্যেও বিদ্যুতের ব্যবহার করতো। নারীস্থানে রেল-পথ বা পাকা বাঁধা সড়ক ছিল না। তাঁরা পায়ে হেঁটে চলাচল করতো বিধায় তাঁদের কোন সড়কদুর্ঘটনা ঘটতো না। দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতে তাঁরা আকাশ পথ ব্যবহার করতো। বিদ্যুতের সাহায্যে পরিচালিত 'বায়ু-শকট' অর্থাৎ আকাশ যানের মাধ্যমে ভগিনী সারার সাথে সুলতানা আকাশ পথ ভ্রমণ করেন। (১৫)

এভাবে প্রতিটি গল্পের পরতে পরতে বেগম রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্ক চেতনার উপস্থিতি দেখা যায়। নারীশিক্ষার প্রভাবে অন্তঃপুরের নারীরা অবরোধপ্রথা ভেঙ্গে বহির্জগতে প্রবেশ করে নিজেদের স্থান অধিকারে সক্ষম হয়। শিক্ষিত এবং বিজ্ঞানমনস্ক নারীসমাজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে অল্প সময় ব্যয় করেই পরিচালনা করতে সক্ষম তার প্রমাণ দেন। রোকেয়ার স্বপ্নরাজ্যের নারীস্থানে নারীরা বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে ‘জলধর বেলুন’ আবিষ্কার করে ‘জলধরকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা বৃষ্টির পানি করায়ত্ত, করেন। এই জলধর বেলুন ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিকাজের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। ভাবতে অবাক লাগে বিদ্যুৎ যখন কেবল আবিষ্কার হয়েছে। এর ব্যবহার তখনো সকলের কাছে পৌঁছেনি। এসময় রোকেয়া এই বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়ার চিন্তা করেছেন। নারী বিজ্ঞানীরা সূর্যতাপ সংগ্রহ করার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন এবং সেই জ্বালানি প্রয়োজনমতো ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। ১৯০৫ সালেই বেগম রোকেয়া সৌরশক্তি সংগ্রহ করা এবং কৃত্রিম মেঘ তৈরি করা যে সম্ভব, সে কথা কল্পনা করেছিলেন, ভাবলেও আমাদের বিস্মিত হতে হয়!

উল্লিখিত বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার দিক থেকে বেগম রোকেয়া যুগের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগামী ছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ে একনিষ্ঠ আগ্রহ এবং অন্বেষা তাঁর চিন্তাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। তাঁর বহু রচনায় বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা স্পষ্ট স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। বেগম রোকেয়া এ সব কোথা থেকে বা কার কাছ থেকে শিখেছেন, কীভাবে আয়ত্ত করেছেন, এর উৎস পথ আমাদের জানা নেই। তিনি কখনো রূপক অর্থে আবার কখনো সরাসরি বিজ্ঞানের ব্যবহার ও শিক্ষার কথা তাঁর বিভিন্ন গল্প ও প্রবন্ধের পরতে পরতে উল্লেখ করেছেন। আনন্দের বিষয় হলো রোকেয়ার অনুসারী নারীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। নারীরা আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপন দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন। নারীর এই অগ্রযাত্রা কোন অপশক্তির পক্ষেই আর রুখে দেওয়া সম্ভব নয়।

#

লেখক: মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান

২৮.১১.২০২২ পিআইডি ফিচার